রামচরিতের ঢোঁড়াইচরিত হয়ে ওঠা

অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

"...'ঢোঁড়াই চরিত মানস' বিষয়ে আমাদের বিস্ময় কখনো কমে না। এ কেমন উপন্যাস যার পাতায় পাতায় দরকার হয় পাদটীকার? এ কেমন উপন্যাস যার নায়কের নাম 'ঢোঁড়াই'? ঘটনাভূমি আমাদের চিরপরিচিত বাংলাদেশ নয়, বিহার। এখানে নেই আমাদের অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত জীবনের কোনো ছবি। এর জগৎটা গড়ে উঠেছে 'অন্ত্যজ' ধাঙড় আর আর তাদের নিয়ে। আর এই সংগঠনের মধ্যে লেখক আমাদের ফিরিয়ে নিয়েছেন আপাত-প্রাচীন যুগে, আদিকাণ্ড-বাল্যকাণ্ড রামিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যেন কোনো তুলসীদাসী রামায়ণের স্বাদে। অথচ, পূর্বাগত কালপ্রবাহ থেকে ছিন্ন না করেও এ বই আমাদের এক নতুন কালের মুখোমুখি নিয়ে আসে; পরিচিত দেশশ্রী থেকে ছিন্ন না করেও এ বই আমাদের এক নতুন দেশের মুখোমুখি নিয়ে যায়।"[১]

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মাধ্যমে পাঠকের মনে যে বিস্ময়, আবেগ ও আনন্দের সৃষ্টি হয়, উপরের অংশটি তারই এক যথার্থ প্রতিচ্ছবি। সতীনাথের 'ঢোঁড়াই' নিতান্তই সরল, সাদাসিধে অন্ত্যজ ধাঙড় গোষ্ঠীর একজন। এহেন ঢোঁড়াইয়ের মনে লেখক জাগিয়ে তুলেছেন অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার ও সবার উপরে নিজের সত্তার পূর্ণ পরিচয় পাবার এক দুর্বার আকাঙ্খা। যে আকাঙ্খার জোরে ঢোঁড়াই হয় পথের পথিক, আটকে থাকে না কোনো ধরাবাঁধা জীবনের মধ্যে, পরিচিত সংসারের গণ্ডীর মধ্যে। সে ছুটে চলে সমাজের এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে, চেতনার এক স্তর থেকে আর এক স্তরে।

সতীনাথের 'ঢোঁড়াই' নিশ্চিতভাবেই লেখকের কল্পনাজাত। বাস্তবের সঙ্গে তার তফাত অনেক। সে কোনো এক বিশেষ গোষ্ঠীর শুধুমাত্র প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই রূপান্তরের এক আকুল প্রচেষ্টা। লেখকের ডায়েরী থেকে নেওয়া উক্তি, আমাদের এই ধারণাকেই আরো সুস্পষ্ট করে তোলে।

"My work/creation was not merely representations but transformation."[২]

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সম্পর্কে এই ছিল সতীনাথের বক্তব্য।

স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে রূপান্তর বা 'transformation' বলতে লেখক কী বোঝাতে চাইছেন। এর উত্তর লুকিয়ে আছে দুটি স্তরে। একটি স্তরে তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' রূপান্তরিত হচ্ছে সতীনাথের 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'। উপন্যাসের 'ঢোঁড়াই'—এক অন্ত্যজ ধাঙড়, রূপান্তরিত হচ্ছে এ যুগের পুরুষোত্তম

'রাম'-এ। অন্য স্তরে রূপান্তর ঘটছে এক অত্যন্ত সাধারণ, নীচুশ্রেণীর 'ঢোঁড়াই' থেকে সমাজের এক জনপ্রিয় নেতা 'ঢোঁড়াই'-এ। এই দ্বিতীয় রূপান্তরটি এক নীচু জাতের সামান্য মানুষের সামাজিক রূপান্তর।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় প্রথম স্তরের রূপান্তর—যেখানে 'রাম চরিত মানসের' তুলসী-রামের রূপ নিয়েছে সতীনাথের 'ঢোঁড়াই চরিত মানসের' 'ঢোঁড়াই-রাম'।

ক. সতীনাথ ও তুলসীদাস

প্রায় ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজের উপন্যাসের আঙ্গিক হিসেবে তুলসীদাসের রামচরিত মানসকে সতীনাথ বেছে নিয়েছিলেন। বস্তুত ঢোঁড়াই চরিত মানস আর রামচরিত মানস-এর মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে গঠনগত কোনো তফাতই চোখে পড়ে না। কিন্তু উপন্যাসটিকে যখন এক বিশেষ কাল ও দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়, তখনই মূল ফারাকটি চোখে পড়ে।

সতীনাথের কথায়,—

"ঢোঁড়াইকে এ যুগের শ্রীরামচন্দ্র করবার কঠিন কাজ ছিল আমার সম্মুখে। শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে ছোট আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণ লোকের মন ভরে না। রামায়ণের দিকে আমার নজর পড়েছিল আরও কয়েকটি কারণে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের গভীর ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে রামায়ণের কাঠামোতে ফেলা বই বেমানান হবে না, এই ছিল আমার ধারণা। এ ছাড়া আরও একটা বড় প্রয়োজনের তাগিদ ছিল। ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমনভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমনভাবে তারা ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসাবে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে, তাই নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখব। সমগ্র গ্রামীণ সমাজ তুলে ধরবার ইচ্ছা। মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে, পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে। এর বিবরণ দিতে গেলে, মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিত কিছু কথা না দিয়ে উপায় নাই। অথচ নিটোল উপন্যাসে প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে অপর জিনিসগুলোর একটা সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকা দরকার। রামায়ণ মহাভারতে কত উপাখ্যান যেমন মূল কাহিনীর সঙ্গে আলগাভাবে গাঁথা, সেইরকমভাবে লিখলে দেখলাম আমার কাজ চলতে পারে। ভেবেছিলাম আদিকবির আড়ালে আশ্রয় নিলে, হয়তো পাঠকরা বইয়ের পরিবেশ-প্রধানতা ক্ষমা করতে পারবেন, আর সর্বজন পরিচিত, দৃঢ়, কালজয়ী কাঠামোটা গাঁথনির আলগাভাব খানিকটা সামলে নিতে পারবে। মোট কথা, এরকম রূপায়ণের সুবিধা অসুবিধা খতিয়ে সুবিধার দিকটাই বেশি মনে হয়েছিল আমার।"[৩]

এই ছিল সতীনাথের প্রকৃত অভিলাষ। তাঁর মতে উত্তর ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনে মহাকবি তুলসীদাস ও তাঁর রচিত মহাকাব্য 'শ্রীরাম চরিত মানস' এখনও অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করে আছে। উপরের উদ্ধৃতিটি থেকে এই ধারণাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর এই মতকে স্বীকৃতি দিয়েছেন পূব ও পশ্চিম—দু দিকেরই পণ্ডিতবর্গ। যেমন

ধরা যাক স্যার জর্জ গ্রীয়ারসনকে।[৪] পশ্চিমী পণ্ডিতদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তুলসীদাসের সামাজিক তাৎপর্যের গভীরে পৌঁছেছিলেন :

"The first thing to be noted about him is his success. India has had many reformers, but none except perhaps the Buddha, has been adopted as a religious teacher by so many professed followers. Kabir's or Dadu's adherents may be numbered by hundreds of thousands, but today at least ninety millions of the people of upper India acknowledge Tulsi as their guide."[৫]

আর তুলসী দাসের দেশজ মূল্যায়ণের মধ্যে অন্যতম নির্ভরযোগ্য হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর বিশ্লেষণ :

"Tulsi Das was a poet, devotee, learned reformer, popular leader & a creator of the future. Among these feautres no one is less important than the others. Hence he was able to keep the balance in all directions & to create an epic without peer which till today remains the guide of North India and will so remain when the new India is born"—[৬]

ভারতীয় মহাকাব্য সম্পর্কে সতীনাথের বক্তব্য,—

"Ramayana, Mahabharat & Puranas, present the psychology and character of our nation, as also its aspirations, blemishes and follies.

Importance to human personality—to most fundamental thing in Indian mass mind"—[৭]

অথবা,

"রামায়ণ—vast and varied-roots in hoary past and comprises accumulated wisdom of ages. There is hardly any human activity which it does not cover—"[৮]

এই ধরনের বক্তব্যের সঙ্গে এফ আর আলচিন (F. R. Allchin)-এর মতামত অনেকাংশেই মিলে যায় যখন তিনি বলেন,—

"Tulsi exemplifies a profound and integrated world view, arising from his life and times. His total creation exemplifies a unity, as though he had been able to comprehend the whole age in which he lived."[৯]

এখন, এইসব মতামত ও বক্তব্যকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য ও 'শ্রীরামচরিত মানসের' পূর্ণ বিশ্লেষণ করার জন্য, তুলসীদাসের সামান্য পরিচয় পাওয়া খুবই আবশ্যক। বলতে

গেলে এই জানার মাধ্যমেই তুলসী-রামের থেকে ঢোঁড়াই-রামে যে রূপান্তর হয়েছে তা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

পূর্বসূরী কবীর দাসের মতো, মহান সন্ত রামানুজ ও রামানন্দের আধ্যাত্মিক ধারাই তুলসীদাস গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কবীর যেমন অনেকটা বৈপ্লবিক ভাবেই সমাজের সবরকম বিভেদ ও বর্ণবৈষম্যবাদ মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন, তুলসীর লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির ভিতর থেকে উন্নতি সাধনের। হিন্দু ধর্মকে পরিপূর্ণভাবে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল তাঁর সাধনা। আলচিনের ভাষায়,—

"Tulsi wanted to revitalise every aspect of Hindu society and culture as he found it from within. For this task he had to harmonise the divergent facets of that culture and to integrate them into his spiritual ideology."[১০]

আর একটা ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা দরকার তা হল, তুলসীদাসের 'শ্রীরামচরিত-মানস' বাল্মীকির রামায়ণের নিছক ভাষান্তর নয়। রামায়ণ সংক্রান্ত অন্যান্য আকর-গ্রন্থের সাহায্য তিনি নিয়েছিলেন, এবং তথ্য ও অন্তরের ভক্তির মিশ্রণে যে কাব্য তিনি রচনা করেছিলেন তা হয়ে উঠেছিল ভক্তিবাদের এক অমূল্য নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

তুলসীদাসের কোসলী (হিন্দী) রামায়ণ, যাহার কবি-দত্ত নাম হইতেছে 'শ্রীরামচরিত-মানস', এইরূপ আর একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক, ইহাতে কেবল বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণ করা হয় নাই—তুলসীদাস স্বয়ং বলিতেছেন—

নানা-পুরাণ-নিগমাগম-সম্মতং যদ্,
রামায়ণে নিগদিতং, ক্বচিদ্ অন্যতোঽপি বা।
স্বান্তঃ সুখায় তুলসী রঘুনাথগাথা—
ভাষা নিবন্ধম্ অতিমঞ্জুলম্ আতনোতি॥

"অনেক পুরাণ, বেদ ও শাস্ত্রসম্মত যে কথা রামায়ণে আছে, আরও অন্যত্র হইতে (নিজের অনুভব) একত্র করিয়া, নিজের অন্তরের সুখের জন্য রঘুনাথজীর গাথা, ভাষায় মনোহর ছন্দাদিরূপে বিস্তারপূর্বক তুলসীরচনা করিতেছে।"

(শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের বঙ্গানুবাদ)[১১]

আদি কবির সঙ্গে তুলসীদাসের আর একটি বিশেষ পার্থক্য আমাদের নজরে পড়ে, আর তা হল,—

"আদি কবি তাহার গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন 'রামায়ণ'। অয়ণ শব্দের অর্থ —গতি, মার্গ, আশ্রয়। 'রামায়ণ' শব্দের অর্থ নরোত্তম রামের প্রদর্শিত পথ। বাল্মীকির রামচন্দ্র নর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ, কর্তব্যে স্থির, বিপদে নির্ভীক, সম্পদে সন্তুষ্ট সর্বেশ্বর হইয়াও সর্বস্ব বিসর্জন দিতে কার্পণ্য করেন নাই। ইহাই লোকোত্তর চরিত্র। তুলসীদাসের রামচন্দ্র নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ প্রতীক। সীতাদেবীর বিরহে তিনি সগুণ

সর্বিকার, প্রতিটি বৃক্ষ, লতাকে তিনি আকুলভাবে প্রশ্ন করিতেছেন—"সীতা কোথায়, তোমরা কি আমার প্রাণপ্রিয়া সীতাকে দেখিয়াছ ?" আবার সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষার সময় তিনি নির্গুণ নির্বিকার। তিনি নরদেহধারী সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, তাঁকে ধ্যান করা যায়, অনুকরণ করা যায় না। তুলসীদাস সেই কারণে, সম্ভবত, রামচরিত্র বর্ণন গ্রন্থের নামকরণ করিলেন 'রামচরিত মানস'। তুলসীদাসের রামচন্দ্র তাঁহার মানসপটে সদা জাগ্রত। রামচরিত মানসের ছত্রে ছত্রে এই ভাব পরিস্ফুট।"[১২]

বস্তুতপক্ষে যে গ্রন্থটি তুলসীদাসকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে তাঁর কাব্যের একটি নিজস্ব রূপ দিতে তা হল, 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'[১৩]—একটি ছোট সংস্কৃত পুঁথি হাজার চারেক পদ সমেত, সেখানে আদি কবির 'রামায়ণ' ২৩,০০০ পদের সমাহার। পি, সি, বাগ্‌চীর (P. C. Bagchi) মতে রামের যে রূপান্তর আমরা দেখি কবীরের নির্গুণ ভাব থেকে তুলসীর সগুণ ভাবে, তার জন্য এই ছোট গ্রন্থটির ভূমিকা অনেকখানি।

রামের ভক্তরূপে তুলসীদাসের যে অনুভূতি বা উপলব্ধির প্রকাশ আমরা 'শ্রীরাম চরিত মানসের' প্রায় প্রতিটি ছত্রেই পাই তাকে পণ্ডিতের কথায় বলা যেতে পারে 'দাস্য"[১৪] প্রভুর সঙ্গে ভক্তের প্রায় এক দাসত্বের সম্পর্ক আর সে দাসত্বের আধার কিছুই না পূর্ণ ভক্তি। এই প্রসঙ্গে আলচিন লিখেছেন,

"it is the majesty and lordliness of Rama which call for worship, the rule of Rama as ideal King which provides the worldly ideal of government and the yearning of the soul to be of service which establishes the bond of the servile relationship of the soul with god.'[১৫] তুলসী দাসের নিজের ভাষায় এই একই মত ফুটে ওঠে,—

"উপজই রামচরণ বিশ্বাসা, ভবনিধি তর নর বিনহিঁ প্রয়াসা।
শ্রীরামচরণে হয় বিশ্বাস অপার, অনায়াসে ভবনিধি হয় নর পার।"[১৬]

হিন্দু শাস্ত্র দর্শনের বিভিন্ন ধারা, উপধারাকে একই খাতে প্রবাহিত করাতে চেয়েছিলেন তুলসীদাস এবং তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র সগুণ ভক্তির মাধ্যমেই এই মিলন সম্ভব। এইখানেই তুলসীর নিজস্বতা।

কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে, সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' এই ভক্তির কোনো স্থানই নেই। তাঁর 'ঢোঁড়াই-রাম'কে খুঁজতে হবে সমাজের একদম সাধারণ শ্রেণীর ভিতরে—ভারতের আপামর জনসাধারণের মধ্যে।

"এ যুগে শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষদের মধ্যে। এখানেই হল ঢোঁড়াই-রামের আবির্ভাব আমার মনে।"[১৭]

এখন এই ক্ষেত্রে, স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন মনে উঠতে পারে—সতীনাথ তাঁর উপন্যাসের জন্য কেন বাংলা সাহিত্যের বিবিধ আঙ্গিকের ধারা থেকে একটিকে বেছে নিলেন না। লেখকের ডায়েরী থেকে যে উত্তর আমরা পাই—

"চেষ্টা করেছিলাম যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরতে of essential social

factors which determined the world of Dhorai—তখন প্রশ্ন উঠেছিল কীরকম ভাবে সাজানো যায়। একটি particular form—যা গরীব লোকদের নিয়ে লেখা বইয়ে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত (বামপন্থী) সাহিত্যে—সেটা সাহিত্যের পক্ষে একটু স্থূল মনে হয়েছিল আমার। আর উত্তর ভারতের এ যুগের (১৯৪৫-এ যা শেষ হয়েছে) তার পক্ষে অনুপযোগী হতো আমার বিবেচনায়। (ও জিনিসটা marshalling of facts—এর উপর নির্ভর করে) আর সত্যের অপলাপও হতো। প্রচারমূলক হওয়ারও সম্ভাবনা। আমার চোখ দিয়ে সত্যের বিরুদ্ধে যাবার আমার ইচ্ছা ছিল না।"[১৮]

তাই যদিও সতীনাথের মতে,—

"রামায়ণের কাঠামো এ কাজের পক্ষে artificial form ঠিকই,"[১৯]

তবুও যেহেতু,—

"রামায়ণের কাঠামো কৃত্রিম হলেও—কিন্তু এর tradition ভারতের লোকের মজ্জায় মজ্জায়"—[২০]

তিনি আঙ্গিকের এই ধারাকেই বেছে নিয়েছিলেন ও এর মাধ্যমেই আসল সামাজিক চিত্রকে অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গীতে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। বলাই বাহুল্য আঙ্গিকের এই রূপ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তুলসীদাসের 'শ্রীরামচরিত মানসের' মধ্যে।

সতীনাথের মতে এই বিংশ শতাব্দীতেও মহাকাব্যটির যথেষ্ট সামাজিক তাৎপর্য্য রয়েছে। যদিও উপন্যাসের চরিত্র অনেকাংশেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ; কিন্তু যেখানে ব্যক্তিকে একটি পুরো সম্প্রদায় বা কমিউনিটির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়, সেখানে মহাকাব্যের এই ধারাই পারে সমগ্র সমাজের প্রতিটি স্তরকে একই গভীরতায় বহন করতে, তাদের পূর্ণ আলোয় ফুটিয়ে তুলতে। এবং সতীনাথ যেহেতু ব্যক্তি, সমাজ ও সম্প্রদায়—প্রত্যেককেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন, তাই তাদের ধারক ও বাহক হিসেবে তাঁর উপন্যাসও বেছে নিয়েছে আঙ্গিকের এই বিশেষ রূপটিকে। এ ছাড়াও মহাকাব্যের যে এক নিজস্ব বর্ণনা শৈলী আছে—তার প্রতি সতীনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রথম থেকেই। তিনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন যে এই বর্ণনা পদ্ধতির অসাধারণ জনপ্রিয়তাই তাঁর 'ঢোঁড়াই-রামকে সাধারণের মনের গভীরে পৌঁছে দেবে নিপুণ হাতে। অথচ একই সঙ্গে তাঁর রচনার বিশেষত্ব বা নিজস্বতা ফুটে উঠবে ছত্রে ছত্রে কারণ উপন্যাসটির দেশ কাল ও বিষয় সবই আধুনিক, নতুন—'শ্রীরামচরিত মানসের' সঙ্গে তাদের কোনো সম্বন্ধই নেই। এর জন্যই তিনি লিখেছিলেন,— "এ যুগে মহাকাব্য অচল কিনা সে প্রশ্ন আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। কেন না আমার কাজ ছিল শুধু পুরনো মহাকাব্যের ফ্রেমে ঢোঁড়াই-রাম বাঁধানো।"[২১]

খ. ঢোঁড়াই চরিত মানসে রামচরিত মানসের ব্যবহার

সতীনাথের মতে,—

Form is nothing but the power to extract the fullest from the material'—[২২]

এবং তিনি এও বলেছেন,—

'The test is to what extent the novelist has embodied in words the Material of the book ; realised in language the possibilities of the material'[২৩]

লেখকের এই কথা অনুসারে, প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে আমাদের মনোযোগী হতে হবে উপন্যাসের গভীরে, যেখানে 'রামচরিত মানসের' আঙ্গিকের মধ্যে খুঁজে পাব এ যুগের 'ঢোঁড়াই রামকে'।

উপন্যাসের শুরুতেই আমরা 'রামচরিত মানসের' ব্যবহার দেখতে পাই যেখানে লেখক প্রথম পরিচ্ছেদ 'আদিকাণ্ডে' তাঁর গল্পের স্থানের বিবরণ দিয়েছেন।

'আদি কাণ্ড'

'জিরানিয়ার বিবরণ'

'অযোধ্যাজী নয়, এখনকার জিরানিয়া রামচরিত মানসে এর নাম লেখা আছে 'জীর্ণারণ্য'। পড়তে না পারো তো মিসিরজীকে দিয়ে পড়িয়ে নিও। তখনও যা ছিল, এখনও প্রায় তাই।'[২৪]

সুতরাং লেখার শুরুতেই সতীনাথ তাঁর পাঠককে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর গল্পের স্থান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যা নয়। বরং ঘটনার কেন্দ্রস্থল বিহারের পূর্ণিয়া শহরের কাছে একটি শহরতলী জিরানিয়া। এখানেই ঢোঁড়াই-রামের আবির্ভাব।

মহাকাব্যের আর একটি খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল সতীনাথের কাছে আর তা হল,—

'যেখানে সংকট আসে, বাছাবাছির সময় আসে, তখন আমাদের average লোক রামায়ণ মহাভারত পুরাণের মনের মতো একটা কাহিনীর উপদেশ পেলে বর্তে যায়—খোঁজে। ওসব বইয়ে যা খোঁজ তাই পাওয়া যায়।'[২৫]

লেখকের এই মতের মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় কেন তিনি তাঁর উপন্যাসের প্রায় সব স্তরেই 'দোহার' ব্যবহার করেছেন কারণ, সামাজিক স্থান ও কাল বদলে গেলেও, এখনও সাধারণ মানুষ তাদের মনের অনুভূতি ও উপলব্ধির সঠিক প্রকাশ বা রূপ দিতে মহাকাব্যের দোহার বা পদেরই আশ্রয় নেয়।

এই জন্যই যখন শিশু ঢোঁড়াইয়ের বাবা ক'দিনের জ্বরে মারা যায়, তার বউ বুধনীকে সান্ত্বনা দিতে মহতো নন্দলাল বলে,—

'ছিতি জল পাবক গগন সমীরা

পঞ্চ রচিত অতি অধম শরীরা।'[২৬]

এই দোহাটি শ্রীরামচরিত মানসের 'কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড' থেকে নেওয়া হয়েছে যেখানে শ্রীরাম মৃত বালির স্ত্রী তারাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এই বলে যে মনুষ্যদেহ নশ্বর কিন্তু

তার আত্মা অবিনশ্বর। সুতরাং মৃত্যুজনিত শোক প্রকাশ করা কখনই উচিত নয়।

'ছিতি জল পাবক গগন সমীরা, পঞ্চ রচিত অতি অধম শরীরা।
প্রগত সো তনু তব আগে সোবা, জীব নিত্য কেহি লগি তুম্হ রোবা।।'
'ক্ষিতি অপ্ তেজ আর মরুৎ ও ব্যোম, পঞ্চভূতে সৃষ্ট এই নশ্বর জীবন।
প্রত্যক্ষ শরীর শুধু আত্মা অনশ্বর, তবে কেন কাঁদিতেছ হতেছ কাতর।।'[২৭]

আরেক জায়গায়, ঢোঁড়াইয়ের মা বুধনী যখন বাবুলাল তাৎমাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার জন্য, কচি ছেলে 'ঢোঁড়াই'কে বোবা সন্ন্যাসী বৌকা বাওয়ার কাছে ফেলে দিয়ে গেল, তখন বাওয়ার মনে হলো যেন শ্রীরামই শিশু ঢোঁড়াইরূপে তার কাছে এসেছে, তাই আমরা পড়ি,—

'অনেকদিন গড়িমসি করবার পর বুধনী মন ঠিক করে ফেলে। একদিন সকালবেলায় গোঁসাইথানে বৌকা বাওয়ার পায়ের কাছে ছেলেটাকে ধপ্ করে নামায়। কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে নিজের দুঃখের কথা বলে। তারপর ঢোঁড়াইকে এখানে রেখেই বাবুলালের বাড়ি চলে যায়। ঢোঁড়াই তখন আঙুল-চোষা ভুলে বাওয়ার ত্রিশূলটা নিয়ে খেলা করছে। বাওয়া দেখে যে তার গভীর নাভিকুণ্ডের উপর তিনটি রেখা পড়েছে, ঠিক বালক শ্রীরামচন্দ্রজীর যেমন ছিল।'

'কটি কিংকিণী উদর এর রেখা। 'কটিতে মেখলা শোভে ত্রিবলি উদরে।
নাভি গভীর জান জিন্হ দেখা।। সেই জানে গভীরতা যে দেখে নাভীরে।।'[২৮]

তুলসীদাসের এই দোহাটির মধ্যে দিয়ে বালক রামচন্দ্রের অপরূপ রূপের একটু আভাস আমরা পাই রামচরিত মানসের 'বালকাণ্ডে'।

এই একই অনুভূতির পুনঃপ্রকাশ আমরা বাওয়ার মধ্যে দেখতে পাই, যখন যুবক ঢোঁড়াই অত্যন্ত দ্বিধাভরে তার কাছে কিছু টাকা চায়, যার সাহায্যে সে তার ভালোবাসার 'রামিয়া'-কে বিয়ে করতে পারবে। এই 'পশ্চিমা উরতিই' তখন ঢোঁড়াইয়ের জীবনের প্রাণ, স্বপ্নের নারী। বাওয়ার কাছে ঢোঁড়াইয়ের এই আর্জি মনে হয়,—

'...ঢোঁড়াইটা এখনও ছেলেমানুষ আছে, মোচ উঠলে কী হয়। না হলে আজ যে খানিক আগে সকলে টাকা খরচ করবার নানারকম রাস্তা দেখাচ্ছিল তখন সে কারও জবাব দেয়নি কেন। ওরে মুখ্যু, এই সোজা কথাটুকু বুঝতে পারলি না। থানে মন্দির তৈরী করবার চাইতেও বেশি আনন্দ আমার তোকে সুখী দেখলে, একথাও কি মুখ ফুটে তোকে বলতে হবে নাকি? ছোটবেলায় যখনই তোকে কোলে নিয়েছি, তখনই মনে হয়েছে যে বুড়ো রাজা দশরথ অযোধ্যাজীতে এমনি করেই একদিন তাঁর রামচন্দ্রজীকে কোলে নিয়েছিলেন।

'ধূসর ধূরি ভরে তনু আয়ে। 'ধূলি ধূসরিত অঙ্গ আসিয়া দাঁড়ায়,
ভূপতি বিহঁসি গোদ বৈঠায়ে।।' রাজা হাসি নিতে ক্রোড়ে দু বাহু বাড়ায়।'[২৯]

উপরের এই দুটি ক্ষেত্রেই এক অদ্ভুত নজরকাড়া সাদৃশ্য চোখে পড়ে সতীনাথের ঢোঁড়াই-রাম ও রামচরিত মানসের তুলসী-রামের মধ্যে। বস্তুতপক্ষে সতীনাথের উপন্যাস

আমাদের একটা কথা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, দেবতা থেকে একদম সাধারণ মানুষে রূপান্তর ঘটলেও, মানুষের মনের যে মূল অনুভূতি, তার প্রকাশ দেশ স্থান কাল নির্বিশেষে প্রায় একই থাকে। বাওয়ার মনে ঢোঁড়াইয়ের জন্য যে পিতৃস্নেহের ছায়া আমরা দেখি, শ্রীরামচন্দ্রের জন্য মহারাজা দশরথ ও মহারাণী কৈকেয়ীর মনেও সেই একই অভিব্যক্তির মূর্ছণা বাজে।

শুধু এই নয়, সতীনাথের নারীচরিত্র 'রামিয়ার' মধ্যেও এই একই রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। 'পশ্চিমা ঔরত' রামিয়া, ঢোঁড়াই-পত্নী রামিয়া ঢোঁড়াইচরিত মানসের 'সীতা', এ এ যুগের 'সীতা'। সাধারণের মধ্যে থেকেও সে যে অ-সাধারণ তা তাকে আর তার পাশে সব তাৎমা 'ঝোটাহাদের' দাঁড় করালেই বোঝা যায়। আর তাই জন্যই বোধহয় তাকে দেখেই ঢোঁড়াইয়ের মনের স্বপ্নরাজ্যের দুয়ার খুলে যায়, যেখানে শুধু সে আর তার রামিয়া—তাদের নিজস্ব জগৎ গড়ে তোলে, আর কেউ থাকে না, বাওয়া পর্যন্ত নয়। কিন্তু 'শ্রীরামের' মতই ঢোঁড়াইও তার রামিয়াকে সারা জীবনের সাথীরূপে পায় না। দেখতে না দেখতেই তাদের ছোট্ট সাজানো শান্তির সংসারের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় রাবণরূপী 'সামুয়ার'—এক ক্রীশ্চন ধাঙড়। তুলসীদাসের সীতার অগ্নিপরীক্ষার মতো সতীনাথের রামিয়াকেও এ যুগের এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। রামিয়াকে পিছনে ফেলে ঢোঁড়াই এগিয়ে চলে এক নতুন পথের পথিক হয়ে। এ যুগের রাম ও সীতার—ঢোঁড়াই ও রামিয়ার মিলন অসম্পূর্ণই থেকে যায়। সতীনাথের উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছদ—'স্বর্ণসীতা' এই অসমাপ্ত মিলনের কাহিনীই বহন করে যখন ঢোঁড়াই তার পুরণো গৃহে, ফেলে যাওয়া নারী ও জীবনের কাছে ফিরে আসে নতুন জীবনের নতুন আশা নিয়ে কারণ তার কাছে তখন 'অবধ তঁহা জঁহ রামিয়া নেবাসু', যেখানে রামিয়া সেখানেই অযোধ্যা'।[৩০]* কিন্তু তার গৃহ তখন নতুন লোকের বাসা—রামিয়ার কোনো উপস্থিতিই সেখানে নেই।

রামচরিত মানসের 'সীতামার' মত সে ঢোঁড়াই চলে যাওয়ার কিছুদিন বাদেই এ পৃথিবী ছেড়েই চলে যায় অনাদরে, বিনা সুবিচারে। সতীনাথের উপন্যাস তাই এক নিঃসঙ্গ, ক্লান্ত, শ্রান্ত মানুষের জীবনের অসমাপ্ত কাহিনী। কারণ ঢোঁড়াই আবার নতুন যে যাত্রা শুরু করে তার শেষ কোথায় সে নিজেই জানে না। এই চলাই এ যুগের-কলিযুগের ঢোঁড়াই-রামের যাত্রা।

সতীনাথ ও তুলসীদাস—দুজনেই তাঁদের লেখায় 'কলিকাল' শব্দটির বেশ ঘন ঘনই ব্যবহার করেছেন। এবং অনেকটাই এক অর্থে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যা সমার্থক মনে হয়, একটু গভীরে প্রবেশ করলেই বোঝা যায় যে তুলসীদাসের 'কলিকাল' থেকে সতীনাথের 'কলিকালের' মধ্যে একটি সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটেছে আর সেটা বোঝা যায়

---

* তুলসীদাস এই একই দোহা লিখেছেন,—
'অবধ তঁহা জঁহ রাম নেবাসু'[৩১]—অর্থাৎ যেখানে রাম সেখানেই অযোধ্যা।

বিষয়বস্তুর পরিবর্তন থেকে। দুটি ক্ষেত্রেই 'কলিযুগ' বলতে এমন এক সময় বা কালকে বোঝানো হয়েছে যেখানে সমাজ বা জীবনে মূল নীতিগত সুস্থ স্বাভাবিক গুণগুলিই অনুপস্থিত। কিন্তু এখানেই মিলের শেষ, কারণ সতীনাথের 'কলিকাল' এক নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালের বাহক আর তুলসীদাসের 'কলিযুগ' ইতিহাস-উদাসীন অনির্দিষ্টতায় পরিব্যাপ্ত।

তাই ঢোঁড়াই যখন মনস্থির করে 'বুরবক কিরিস্তান্'[৩২] (বোকা খৃস্টান) ধাঙড়গুলোর সঙ্গে 'পাক্কী' মেরামতের কাজে যোগ দিতে, তার এই কাজকে তাৎমার দল মোটেই সুনজরে দেখে না। বরং তাদের মনে হয় যে এর দ্বারা তাৎমা গোষ্ঠীর বড়ই সম্মানহানি হয়েছে। এবং এর জন্য ঢোঁড়াইয়ের অভিভাবক হিসেবে বাওয়ার ওপরই তাৎমা পঞ্চায়েতের যত ক্রোধ গিয়ে পড়ে। পঞ্চর ধারণা হয় বাওয়ার আস্কারাতেই ঢোঁড়াই আজ এমন লাগামছাড়া কাজ করতে পারে।

'বাওয়াটাই যত নষ্টের গোঁড়া।
জাকে নখ অরু জটা বিশালা।
সেই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা॥
লুটিশ দাও বাওয়াকে।'[৩৩]

উপন্যাসের এই সামাজিক চিত্রের পাশে, তুলসীদাসের এই 'চৌপাই'টি আমরা পাই রামচরিত মানসের 'উত্তর-কাণ্ডে' যেখানে ত্রিকালজ্ঞ 'ভুশুন্ডী কাক' বিষ্ণুর বাহন 'গরুড়'কে কলিকালের বর্ণনা দিচ্ছেন। এই কাল এমন একটি সময় যখন মানুষের বাইরের রূপই তার মূল্যের মাপকাঠি হয়, ও সত্য এবং জ্ঞান মিথ্যা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকে।

'নিরাচার জো স্রুতিপথ ত্যাগী, কলি জুগ সোই জ্ঞানী বৈরাগী।
জাকে নখ অরু জটা বিশালা, সোই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা॥
আচারবিহীন আর শ্রুতিপথ ত্যাগী, কলিযুগে সেই জ্ঞানী পরম বৈরাগী।
যাহার বর্দ্ধিত নখ শির জটাতলে, প্রসিদ্ধ তাপস মানে তারে কলিকালে॥[৩৪]

আরেক জায়গায়, তুলসীদাস লিখছেন 'কলিকালে',—

'কুলবন্ত নিকারহিঁ নারি সতী, গৃহ আনহিঁ চেরি নিবেরি গতী।
সুত মানুপিতা তব লৌঁ, অবলা নহিঁ ডীঠ পরী জব লৌ॥
কুলবতী সতী-স্ত্রীরে বহিস্কার করি, কুলনষ্ট করে আনি দাসী ঘরে ধরি।
পিতামাতা মানে পুত্র শুদ্ধই তখন, নারী প্রতি দৃষ্টি নাহি পড়ে যতক্ষণ॥'

অথচ, এই চৌপাইটিই সতীনাথ ব্যবহার করেছেন বাওয়ার মনের ভাব বোঝাতে যখন ঢোঁড়াই রামিয়াকে নিয়ে নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্নে চঞ্চল, অস্থির।

হ্যাঁরে, "ঢোড়াই, তোর কি একটুও কষ্ট হচ্ছে না, আমাকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে"—দূর একথা কি জিজ্ঞাসা করা যায়? হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে।

সুত মানহিঁ মাতু-পিতা তব পোঁ।
অবলা নহিঁ ডীঠ পরী জব জব লো ॥'৩৬

বৃটিশ রাজ ও স্থানীয় জমিদার বর্গের অসাধু আঁতাতে যে চরম আর্থিক ও সামাজিক দুর্দশার দিন ঘনিয়ে আসে দেশের সাধারণ মানুষের উপর, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সতীনাথ আরেকটি 'কলিকাল' সম্পর্কিত তুলসীদাসী দোহার প্রয়োগ করেন। মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ পরোক্ষ ভাবে হলেও তাৎমাটুলি ও ধাঙড়টুলির গায়ে এসে ঠিকই ধাক্কা মারে। বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেট এসে তাদের সাবধান করে দেয় যে তারা যদি কংগ্রেসী লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাহলে তাদের প্রত্যেককেই জেলে পুরে দেওয়া হবে। আবার অন্যদিকে 'মাষ্টার সাহেবের' কংগ্রেসী ছেলে এসে তাদের জানায় যে,—

'...রংরেজ সরকারের জন্যই তাৎমাদের রোজগার নেই। অনেকদিন আগে নাকি 'সরকার' তাৎমাদের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে নিয়েছিল।'৩৭

অবশ্যই এই ধরণের খবর তাৎমাদের বড়ই উত্তেজিত করে ও তুলসীদাসের সঙ্গে তারা একমত হয় যে 'কলিকালে,'—

'নৃপ পাপ পরায়ণ ধর্ম নহিঁ।
করি দন্ড বিড়ম্ব প্রজা নিত'হী ॥'৩৮

এর মানে,—

'নৃপ পাপ পরায়ণ ধর্মে নাহি মতি, বিড়ম্বিত দণ্ডে প্রজা ইহা রাজনীতি ॥৩৯

দেখা যাচ্ছে তুলসীদাসের 'শ্রীরামচরিত মানস' থেকে সতীনাথের 'ঢোঁড়াইচরিত মানসের' মধ্যে একটি সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটেছে। এবং যতই আমরা উপন্যাসের গভীরে ঢুকে আরো দোহা বিশ্লেষণ করব ততই এই পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি আমাদের চোখের সামনে পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠবে।

রূপ বদলের প্রথম ধাপটি মহাকাব্যের দৈব বিশ্বাসের সার্বিকতা থেকে উপন্যাসের মানবিক সুনির্দিষ্টতায়। এই ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি উদাহরণই দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমেই, তাৎমাদের 'বকরহাট্টা' এস্টেটের জমিদারবাবু যখন কতকটা ঈর্ষাতুর হয়েই ধাঙড়দের বসতি সংক্রান্ত বাঙালি উকীল হরগোপালবাবুর সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের কথা চিন্তা করেন,—

"ঐ কিরিস্তান ধাঙড়গুলোর বাংগালীদের সঙ্গেই খাপ খায়। যাক্‌গে মরুকগে! রামচন্দ্রজী! 'কৃপা তুমহারি সকল ভগবানা"।৪০

অথচ বালকান্ডে এই দোহাটি তুলসীদাস লিখেছেন শ্রীরামের জন্মের আগে দৈব ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। দোহাটির বক্তব্য ভগবান বিষ্ণুর কাছে নারদ মুনির দম্ভ প্রকাশ শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে।

'নারদ কহেউ সহিত অভিমানা, কৃপা, তুম্হারি সকল ভগবানা।
করুণানিধি মন দীখ বিচারী, ঔর অঙ্কুরেউ গরব তরু ভারী ॥'

নারদ কহিল তবে মনে অভিমান, সকলি তোমার কৃপা জানি ভগবান।
কৃপাসিন্ধু কাছে মুনি-মন উদ্ভাসিত, দর্প তরু নারদের মনে অঙ্কুরিত ॥'৪১

আবার যখন, বাওয়া প্রভু রামজীর কাছে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানায় একমাত্র বন্ধন ঢোঁড়াইকে তার কাছে পাঠানোর জন্য, তার ভাষা হয়,—

'করউঁ কাহ মুখ এক প্রশংসা'···মাত্র একটা মুখ, তাও কথা বলতে পারি না।···তা দিয়ে তোমার আর কতটুকু প্রশংসা করতে পারি রামজী।"৪২

বালকাণ্ডের এই দোহাটির মধ্যে দিয়ে রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি পরশুরামের প্রশংসাবাক্যই প্রকাশ পায়।

'করৌঁ কাহ মুখ এক প্রশংসা, জয় মহেস মন মানস হংসা।
অনুচিত বহুত কহেউঁ অগ্যাতা, ছমহু ছমামন্দির দোউ ভ্রাতা ॥'

'কত বা প্রশংসা করি এক মুখে আমি, মহেশ মানস হংস জয় হোক স্বামী।
বহু অনুচিত বাক্য কহেছি অজ্ঞানে, ক্ষমার মন্দির ক্ষম ভ্রাতা দুই জনে ॥'৪৩

আরেকটি ক্ষেত্রে ত্রিকালজ্ঞ ভুশণ্ডি কাক ও খগ-রাজ গরুড়ের ভিতর কথোপকথনের মধ্যে উত্তরকাণ্ডে ভুলসীদাস লিখেছেন,—

'নহীঁ দরিদ্রসম দুখ জগ মাহীঁ, সন্ত মিলন সম সুখ কহুঁ নাহীঁ।
পর উপকার বচন মন কায়া, সন্ত সহজ সুভাব খগরায়া ॥

দারিদ্র সমান দুঃখ নাহি এ জগতে, সাধু সঙ্গ সম সুখ না পারে মিলিতে।
কায়মনোবাক্যে হয় পর উপকারী, সাধুর স্বভাব ইহা জেনো হে, সর্পারি ॥'৪৪

এই একই দোহার উদয় হয় বৌকা-বাওয়ার মনে, যখন তাৎমারা গানহী-বাওয়ার মূরতটিকে কোথায় রাখবে তা নিয়ে বড়ই সমস্যায় পড়েছিল।

'মূরতটাকে' নিয়ে মহা বিপদ। এখন কী করা যায়। কী করা যায় ওটাকে নিয়ে। এমনভাবে মূরতের 'দর্শন' পাওয়া গিয়েছে। রাম-সীতার পাশে যদি না রাখতে পারা যায়, তা হলে 'থানেই' বা 'গোঁসাইয়ের' পাশে কী করে রাখা যাবে? বাওয়া ঘাড় নাড়ে —সে তো হতেই পারে না। তবে উপায়? এ কী পরীক্ষায় ফেললে রামজী। এত কৃপা করে, আমাদের ঘরে এলে গানহী মহারাজ, আর আমরা তোমাকে রাখবার জায়গা দিতে পাচ্ছি না। থাকত টাকা সাহেবদের মতো, বাবুভাইয়াদের মতো, রাজদ্বারভাঙ্গার মতো, তিতাম একটা ঠাকুরবাড়ী বানিয়ে, গানহী বাওয়ার জন্যে। ঠিকই বলে গিয়েছে তুলসীদাসজী—'নহি দরিদ্র সম দুখ জগমাহীঁ'। বাওয়ার চোখের কোণ জলে ভরে ওঠে। সারাজীবন তার ভিক্ষে করে কেটেছে। জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত, কখনও দুবেলা ভাত খেয়েছে বলে মনে পড়ে না। একবেলা 'জলপান', একবেলা ভাত—তাও জুটলে, এই তো সব তাৎমাই খায়। এ কেবল তার একার কথা নয়, তবুও 'নহি দরিদ্র সম দুখ জগমাহীঁ'—এই আবছা কথাগুলোর মানে, এই বিপদের ঝলকে হঠাৎ যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'৪৫

আবার যখন, ভাগ্যের এক অদ্ভুত খেলায়, বাওয়া হঠাৎ বেশ কিছু টাকার মালিক হয়,

তাৎমারা প্রত্যেকেই তাকে বহু পরামর্শ দিল কীভাবে সেই অর্থ খরচ করা যেতে পারে। কিন্তু নিরুত্তাপ বাওয়ার কাছ থেকে কোনো প্রকার সম্মতি না পাওয়ায় তারা বড়ই হতাশ হয়। তাদের মনে হয়,—
'নভ দুহি দুধ, চহত এ প্রাণী'। এর কাছ থেকে থানের আর পাড়ার কোনো জিনিস আশা করা, আকাশ দুয়ে দুধ চাইবার মতোই অবাস্তব।[৪৬]
চোপাইটি আমরা পাই অরণ্যকাণ্ডে যেখানে, দৈত্য-সম্রাট রাবণের বোন সূর্পনখা তার সব প্রকার ছল চাতুরী দিয়ে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার বৃথা চেষ্টা করছিল। তার এই আশা যে কত দুরাশা তা ব্যাখ্যা করতেই তুলসীদাস এই পদটি রচনা করেন।

'সেবক সুহ চহ মান ভিখারী, ব্যসনী ধন সুভগতি ব্যাভিচারী।
লোভী জস চহ চারু গুমানী, নভ দুহি চহত এ প্রাণী॥
সেবকের সুখ আর মান ভিখারীর, ব্যাভিচারী গতি আর ধন জুয়াড়ীর।
লোভী যশাকাংখা আর রূপ অভিমানী, আকাশ দুহিয়া দুগ্ধ যেন পায় প্রাণী'॥[৪৭]

আরেকটি ক্ষেত্রে, শ্রীরাম ও সিন্ধু-রাজের ভিতর কথোপকথনের সময় সুন্দরকাণ্ডে লিখেছেন,—

'প্রভু ভল কীন্হ মোহি সিখ দীন্হী, মরজাদা পুনি তুম্হরিয় কীন্হী।
ঢোল গঁবার সুদ্র পসু নারী, সফল তারণা কে অধিকারী॥
ভালই দিয়েছো মোরে শিক্ষা সমুচিত, সকল মর্যাদা প্রভু তোমারি রচিত।
গোঁয়ার দাম্ভিক শূদ্র পশু আর নারী, তাড়না পাবার এরা হয় অধিকারী॥'[৪৮]

এই একই দোহার ব্যবহার ঢোঁড়াই করে যখন তার কাছে তার স্বপ্নের নারী রামিয়া হয়ে ওঠে বিশ্বাসঘাতিনী রামিয়া। যাকে নিয়ে সে একদিন ভালোবাসার ঘর বেঁধেছিল, সেই রামিয়ার জন্যই সে হয় আজ গৃহছাড়া। শুরু হয় তার নতুন পথচলা, চিরপরিচিত পাক্কীর উপর দিয়ে এক নিঃসঙ্গ মানুষের অজানা পথের যাত্রা। বঞ্চনার জ্বালায় জর্জরিত ঢোঁড়াইয়ের মনে হয়,—
'ঢোল, গঁবার, সুদ্র, পশু, নারী' এদের সব সময় মারের উপর রাখতে বলেছে রামায়ণে। প্রথম থেকে যদি এ কথা সে মনে রাখত। কী ভুলই করেছে সে রামায়ণের কথা না মেনে।"[৪৯]
সুতরাং, এতগুলি দোহার বিশ্লেষণের শেষে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তুলসীদাস যে পদ রচনা করেছেন দৈব বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এবং যার ব্যাখ্যা ও অর্থ অ-সাধারণত্বে নিহিত, সেই একই দোহা সতীনাথের উপন্যাসে হয়ে ওঠে অনেক বাস্তবধর্মী, জীবন্ত, মাটি ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম।

পরবর্তী স্তরে, দেখতে পাই, সতীনাথের লেখায় কীভাবে কিছু দোহার মাধ্যমে একটি সম্প্রদায়ের নীতিগত মানবিক চেতনার বিকাশ কোনো বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ও

কোনো বিশেষ চারিত্রিক গুণকে ফুটিয়ে তুলে। বিশ্লেষণের এই ধাপকে বুঝতে গেলে, এই ধরণের কিছু দোহার বিচার অবশ্যই দরকার।

'শ্রীরামচরিত মানসের' বালকাণ্ডে দৈত্যসম্রাট রাবণের রাজত্ব-কাল সম্পর্কে তুলসীদাস লিখেছেন,—

'সুভ আচরণ কতহুঁ নহিঁ হোঈ, দেব বিপ্র গুরু মান ন কোঈ।
নহিঁ হরি ভগতি জগৎ তপ গ্যানা, সপনেহুঁ সুনিঅ ন বেদ পুরানা ॥'
'শুভ কর্ম নাহি হয় আর কোন স্থানে, দেব বিপ্র গুরু আর কেহ নাহি মানে।
নাহি হরিভক্তি নাহি যজ্ঞ তপ জ্ঞান, স্বপ্নে নাহি শুনে কেহ বেদ ও পুরাণ ॥'[৫০]

এই একই দোহার ব্যবহার তাৎমাদের পুরোহিত 'মিসিরজী' করেছেন তাঁর অসন্তোষ জানাতে, যখন ঢোঁড়াই ও তার সঙ্গী সাথীরা নিজেদের নিছক 'তাৎমা' থেকে একটু সম্মানিত পদ 'তন্দ্রিমাছত্রি'তে উন্নীত করতে উপবীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৈতে নেওয়ার জন্য প্রায় ক্ষেপে উঠেছিল এবং মিসিরজীর নিষেধ একপ্রকার অবজ্ঞার সঙ্গেই তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল।

কিছু নিজের নেতৃত্বে তাৎমাদের তন্দ্রিমাছত্রি হতে সাহায্য করলেও, ঢোঁড়াইয়ের অবশ্য সবসময়ই মনে হয়,—

"...রামজীর মর্জি ছাড়া তো কিছু হওয়ার উপায় নেই। কখন না কখন গরীবদের কথা তাঁর মনে পড়বেই।

'গই বহোর গরীব নেবাজু
সরল সবল সাহিব রঘুরাজু ॥
তিনি ছাড়া আর গরীবকে দেখার কে আছে ?'[৫১]

শুধু ঢোঁড়াই নয়, এ-বিশ্বাস প্রত্যেক তাৎমার মনেই লুকিয়ে আছে।

আর এই বিশ্বাসের ভিত যেখানে, সেই 'শ্রীরামচরিতমানসের' বালকাণ্ডে তুলসীদাস এই চৌপাইটি লিখছেন প্রভু শ্রীরামের অপার মহিমা বর্ণনা করতে।

'গঈ বহোর গরীব নেবাজু, সরল সবল সাহিব রঘুরাজু।
বুধ বরনহিঁ হরি জস অস জানী, করহিঁ পুনীত সুফল নিজবাণী ॥
'পতিতপাবন স্বামী দীনবন্ধু নাম, সারল্য শক্তির সীমা রঘুপতি রাম।
বর্ণনা করিয়া হরি যশোরাশি জ্ঞানী, সার্থক সফল করে নিজ পুণ্যবাণী ॥'[৫২]

এইভাবেই মহাকাব্যের ভক্তিমূলক পদগুলি উপন্যাসের পটভূমিতে একটি সম্প্রদায়ের মানবিক ও চারিত্রিক বিকাশের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

আবার যখন, বালকাণ্ডে নারদমুনি গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্বতীর বর্ণনা দেন,—

'সব লচ্ছন সম্পন্ন কুমারী, হোই হি সন্তত পিয়হি পিয়ারী।
সদা অচল এহি কর অহিবাতা, এহি তেঁ জসু পৈহহিঁ পিতু মাতা ॥
সর্ব সুলক্ষণযুক্তা তোমার কুমারী, পতিপ্রিয়া রহিবেন আজীবন ধরি।
অটল সৌভাগ্য রবি ভাতিবে ইহাঁর, পিতা মাতা গর্বান্বিত গৌরবেতে তাঁর ॥'[৫৩]

—এই একই অর্থে, গোষ্ঠীগত প্রথা অনুসারে, মহতো ও মিসিরজী, ঢোঁড়াই ও রামিয়ার বিবাহ উপলক্ষে রামায়ণ থেকে পাঠ করে,—

'মহতো ঢুলছিল বসে। সে নেশার আমেজে আছে এখন। হঠাৎ চমকে উঠে হড়বড় করে বলে ফেলে—

'সব লচ্ছন সম্পন্ন কুমারী।
হোইহি অন্তত পিয়হি পিয়ারী॥'

সব সুলক্ষণ আছে এ মেয়ের। এ চিরকাল 'পুরুষের' পিয়ারী থাকবে। এইবার মিসিরজী বলেন,—

'সদা অচল এহি কর অহিবাতা।
এহি তে' জস্ পইহহিঁ পিতুমাতা॥'

এর এয়োতি অচল থাকবে, এর জন্য এর বাপ-মার নাম হবে।'[৫৪] তাই, তুলসীর লেখায় যা হয়ে ওঠে দৈবত্বের বর্ণনা, সতীনাথের উপন্যাসে তারই ব্যবহার হয় সাম্প্রদায়ের প্রথার অঙ্গ রূপে।

অন্য ক্ষেত্রে, রাণী কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর চক্রান্তে শ্রীরামের বনবাসে যাত্রার কথা শুনে অযোধ্যাবাসীর মনের ক্ষোভের প্রকাশ তুলসীদাস করেছেন,—

'সত্য কহহিঁ' কবি নারি সুভাউ, সব বিধি অগহু অগাধ দুরাউ।
নিজ প্রতিবিম্বু বরুকু গহি জাঈ, জানিন জাই নারি গতি ভাঈ॥
পণ্ডিতে ঠিকই বলে নারীর স্বভাব, দুর্গম অগাধ গুপ্ত সতত এ ভাব।
নিজ প্রতিবিম্ব ধরা সাধ্য তবু হয়, নারীর মনের কথা বোঝা নাহি যায়॥'[৫৫]

এই চৌপাইটি যে মোটেই বিস্মৃত নয় এবং আজও মানুষের মুখে মুখে বড়ই প্রাণবন্ত সেটাই সতীনাথ দেখিয়েছেন যখন তাৎমা পঞ্চায়েতের সভ্যগণ বারবার ঢোঁড়াইকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে রামিয়া তার স্ত্রী হিসেবে বড়ই অনুপযুক্ত। তাদের কথায়,—

'হাঁ, দেখলি তো ঢোঁড়াই, বিয়ের আগেই আমরা মানা করেছিলাম। হাতির মতো জোয়ান মেয়ে পাচ্ছিমের পানির। 'কান করই অবলা প্রবল'···মহতোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাবুলাল পাদপূরণ করে দেয়—'কে হি জগ কালু ন খাই।'

হেঁপো তেরও···ছড়া কাটে—

'নিজ প্রতিবিম্বু বরুকু গহি জাঈ।
জানি ন জাই নারি গতি ভাই॥'

আরশির উপর নিজের ছায়া যদি বা ধরে রাখা সম্ভব হয়, তবু মেয়েদের মনের গতি জানা সম্ভব নয়।'[৫৬]

'শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে যাওয়ার আসল কারণ শুনে মাতা কৌশল্যার যে অবর্ণনীয় শোক তার প্রকাশ অযোধ্যাকাণ্ডে তুলসীদাস করেছেন,—

'রাখি ন সকই প কহি সক জাহু, দুহু ভাঁতি ঔর দারুণ দাহু।

লিখত সুধাকর গা লিখি রাহু, বিধি গতি বাম সদা সব কাহু ॥
না পারে রাখিতে কিংবা যাও বাছা বলা, উভয় প্রকারে হৃদে নিদারুণ জ্বালা।
বিধাতার বিধি দেখ বিপরীত সাজে, সুধাকর লিখিবারে রাহু হয় কাজে ॥'৫৭

অথচ, সতীনাথের উপন্যাসে এই দোহাটির মাধ্যমে এক অত্যন্ত বিশৃঙ্খল আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে একটি সম্প্রদায়ের মানসিক চিন্তা ও উদ্বেগই প্রকাশ পায়। যে গ্রামটিতে ঢোঁড়াই তার জীবনের পরবর্তী পরিচ্ছেদ শুরু করে তার নাম—বিস্‌কান্ধা। জমিই সেখানে অন্নদাতা—অর্থোপার্জনের একমাত্র পথ। সুতরাং এই প্রথম জীবিকার জন্য ঢোঁড়াইকে চাষ-বাসের কথা ভাবতে হয়। কিন্তু গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খুব একটা সাদর অভ্যর্থনা সে পায় না। তার একটাই কারণ। সে সময়কার ওই কঠিন আর্থিক পরিবেশে নিজেদের রোজগারেরই কোন ঠিক নেই, তার ওপর আবার নতুন মানুষকে জমি জায়গা দিয়ে বসবাস করানোর কথা ভাবাই দুষ্কর। প্রবীণ গ্রামবাসী 'বুড়হাদাদার' মুখে তাই শোনা যায়,—

"...ভাল গাঁ বেছেচ রোজগারের জন্য। আমাদেরই আজকাল খাওয়া জোটে না। যা দিনকাল পড়েছে। দিন দিনই খারাপ হচ্ছে। 'বিধিগতি বাম সদা সব কাহু।' ভগবান সবসময় সকলের উপর নারাজ।...৫৮

শুধু এই নয়, জমিদারদের অপেক্ষাকৃত বিলাসবহুল জীবন যাত্রার সঙ্গে নিজেদের দুঃখ দারিদ্রের তুলনা করে গভীর হতাশার সুরে বুড়হাদাদা বলে,—

'রামচন্দ্রজীর রাজ্যের নিয়মকানুন সব বদলে গেল নাকি ?
'অউর করই অপরাধ
কোউ আউর পাব ফল ভোগু।'
একজন দোষ করে, আর একজন তার ফল পায়! আশ্চর্য।৫৯

অথচ, এই দোহাই অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে যাওয়া থেকে বিরত করতে রাজা দশরথের মুখে শোনা যায়,—

'ঔর করৈ অপরাধ কোউ, ঔর পাব ফল ভোগু।
অতি বিচিত্র ভগবন্ত গতি, কো জন জানৈ জোগু ॥
অপরাধ করে এক ফল পায় আর, বিচিত্র বিধান কেবা জানে দেবতার ॥'৬০

অবশেষে তুলসীদাসের 'রামরাজ্যের' যে বর্ণনা আমরা উত্তরকাণ্ডে পাই,—

'অল্প মৃত্যু নাহিঁ কবনিউ পীরা, সব সুন্দর সব বিরুজ সরীরা।
নহিঁ দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা, নহিঁ কোউ অবুধ ন লচ্ছনহীনা ॥'
অকাল মৃত্যুতে কেহ ব্যথিত না হয়, সবারি সুন্দর দেহ সবে নিরাময়।
নহেক দরিদ্র কেহ নহে দুঃখী দীন, নহে মূর্খ কেহ সেথা সুলক্ষণহীন ॥'৬১

ঢোঁড়াই চরিত মানসে এই একই 'রামরাজ্যের' ডাক 'গান্ধীজী' দিয়েছেন। সাধারণের চেতনায় এ এমনি এক রাজ্য যেখানে দুঃখ নেই, দারিদ্র নেই, জাত-বিচার নেই, অজ্ঞানতার

আঁধার নেই। 'রামজীর' রাজ্যে সবাই সমান, সবাই এক।
'রামরাজ্যে'—

নহিঁ দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা
নহিঁ কোউ অবুধ না লচ্ছনহীনা।

রামরাজ্যে দরিদ্র, দীনদুঃখী, নির্বোধ বা অলক্ষুণে কেউ থাকবে না।[৬২]
সুতরাং উপরের সবকটি ক্ষেত্রেই তুলসীদাসী দোহা সতীনাথের হাতে এক অন্য রূপ পেয়েছে—যে রূপের মধ্যে দিয়ে এক 'সাব অলটার্ন' বা নিম্নশ্রেণীর গোষ্ঠীর মানবিক চিন্তা ও চেতনার বিকাশ হয়েছে। 'তুলসীদাসী রামায়ণ' এদের কাছে নিজেদের জীবনের মতোই বাস্তব ও সজীব।

গ. পরিশিষ্ট

এই বিস্তারিত আলোচনার শেষে এসে একটি সত্য খুবই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। 'শ্রীরামচরিত মানসের' 'তুলসী-রাম' রূপান্তরিত হয় 'ঢোঁড়াইচরিত মানসের' 'ঢোঁড়াই-রামে'—মহাকাব্যের পুরুষোত্তম রাম থেকে উপন্যাসের সাধারণ মানুষের নায়করূপে। তুলসীদাসী 'রামচরিত মানস' এমনি এক গ্রন্থ যার কোনো ক্ষয় নেই, সে সজীব হয়ে মানুষের মনে, মুখে, ভাষায়, কথায় বেঁচে থাকে যুগ থেকে যুগে। তার যাত্রা চিরন্তনের যাত্রা, ইতিহাস ছাড়িয়ে ভক্তির পথ ধরে। কিন্তু এই 'মানস'-ই সতীনাথের উপন্যাসে ইতিহাসের সীমার মধ্যে বাঁধা পড়ে; মহাকাব্যের চিরন্তন যাত্রা উপন্যাসের জাগতিক পথচলায় এসে মিশে যায়। এখানেই ফুটে ওঠে একাধারে 'শ্রীরামচরিত মানসের' অসামান্য তাৎপর্য্য ও সতীনাথের অসাধারণ সৃজনী শক্তি। একে অন্যের পরিপূরক এবং তাই 'যাত্রার' পরিসমাপ্তি ঘটে তুলসীদাস থেকে সতীনাথে; 'শ্রীরামচরিত মানস' থেকে 'ঢোঁড়াইচরিত মানসে।'

সূত্র ঃ

শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত

১। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা ১৯৭৩, পৃ. ক
২। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৩, পৃ. ৪৯৭
৩। তদেব, পৃ. ৪৯৪
৪। The first account of the life of Tulsidas in English was by sir George Grirson, 'Notes on Tulsi Das,' Indian Antiquary XXII 1893.

৫। F. R. Allchin, 'Tulsidas : The Petition to Ram', UNESCO 1966, P. 19. Taken from Imperial Gazetteer, Vol. II (1908) P. 418

৬। Quoted in F. R. Allchin's 'Tulsidas : The Petition to Ram', UNESCO 1966, P. 19. Quotation taken from Hazari Prasad Dvivedi's 'Hindi satitya Ki Bhumika', 1[57]ed. 1940, P. 107 (in Hindi)

৭। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯৮

৮। তদেব

৯। F. R. Allchin, 'Tulsidas : The Petition to Ram', P. 20

৩০। ibid, P. 18

৩১। শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'রামায়ণ' (সাংস্কৃতিকী), কলিকাতা ১৩-৬৮, পৃ. ৩৩

৩২। শ্রী সনৎকুমার মজুমদার অনূদিত, 'শ্রীরামচরিত মানস' প্রথম খণ্ড, কলিকাতা ৩৯৮৪, পৃ. ৯৫

৩৩। P. C. Bagchi, 'studies on the Adhyatma Ramayana', Calcutta, 1935

৩৪। তুলসীদাসের দাস্য-রসের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ডঃ : ভগীরথ মিশ্রের 'সাহিত্য সাধনা ঔর সমাজ' লক্ষ্ণৌ ১৯৫১, পৃপৃ. ৫০-৫৭

৩৫। F. R. Allchin 'Tulsidas : The Petition to Ram', P. 20

৩৬। শ্রী সনৎ কুমার মজুমদার অনূদিত,' শ্রী রামচরিত মানস', দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা ৩৯৮৪, পৃ. ৩০২-৩০৩, দোহা-৭৭, চৌপাই-৫

৩৭। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ৩৯৭৩, খণ্ড, পৃ. ৪৯৪

৩৮। তদেব, পৃ. ৪৯৯

৩৯। তদেব

২০। তদেব

২১। তদেব, পৃ. ৪৯৪-৪৯৫

২২। তদেব, পৃ. ৪৯৫

২৩। তদেব

২৪। তদেব, পৃ. ৩

২৫। তদেব, পৃ. ৪৯৮

২৬। তদেব, পৃ. ৩৩

২৭। শ্রী সনৎ কুমার মজুমদার অনূদিত 'শ্রীরামচরিত মানস', দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৯৮৪, দোহা-৩০, চৌপাই-৪, পৃ. ৭৮-৭৯

২৮। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২ দোহাটি নেওয়া হয়েছে শ্রী সনৎ কুমার মজুমদার অনূদিত 'শ্রীরামচরিত মানস', 'বালকাণ্ড', দোহা-২০৪, চৌপাই-২, পৃ. ১৫০-১৫১

২৯। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড, প. ১০৮, দোহা—'শ্রীরামচরিত মানস' 'বালকাণ্ড', দোহা-২০৮, চৌপাই-৫, পৃ. ১৫৪-১৫৫

৩০। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯১

৩১। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'অযোধ্যাকাণ্ড', দোহা-৭২, চৌপাই-২, পৃ. ৩১৮

৩২। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ৪

৩৩। তদেব, পৃ. ৫০-৫১

৩৪। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'উত্তরকাণ্ড', দোহা-১৪০, চৌপাই-৪, পৃ ৩৩৬-৩৩৭

৩৫। তদেব, ছন্দ-২৮, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯

৩৬। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৯

৩৭। তদেব, পৃ. ১২৪

৩৮। তদেব, পৃ. ১২৫

৩৯। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'উত্তরকাণ্ড', দোহা-১৪৫, চৌপাই-২৯, পৃ. ৩৩৯

৪০। সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, প্র ৩

৪১। 'শ্রীরামচরিত মানস', বালকাণ্ড, পৃ ১০২-১০৩

৪২। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪

৪৩। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'বালকাণ্ড', দোহা-২৮৬, চৌপাই-৩, পৃ. ২১০-২১১

৪৪। তদেব, 'উত্তরকাণ্ড', দোহা-১৯০, চৌপাই-৭, পৃ. ৩৬২-৩৬৩

৪৫। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯

৪৬। তদেব, পৃ. ১০৬-১০৭

৪৭। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'অরণ্যকাণ্ড', দোহা-২৬, চৌপাই-১, পৃ. ২৬-২৭

৪৮। তদেব, 'সুন্দরকাণ্ড', দোহা-৬০, চৌপাই-৩, পৃ. ১৪০১৪১

৪৯। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪৯

৫০। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'বালকাণ্ড', দোহা-১৯০, চৌপাই-৪, পৃ. ১৩৮-১৩৯

৫১। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৭

৫২। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'বালকাণ্ড', দোহা-১৭, চৌপাই-৪, পৃ. ৩৬-৩৭

৫৩। তদেব, 'বালকাণ্ড', দোহা-৭৮, চৌপাই-২, পৃ. পৃ. ৫৬-৫৭

৫৪। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী,' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৩৪

৫৫। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'অযোধ্যাকাণ্ড', দোহা-৪৬, চৌপাই-৪, পৃ. ৩০০-৩০১

৫৬। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪৯-১৪৩

৫৭। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'অযোধ্যাকাণ্ড', দোহা-৫৩, চৌপাই-১, পৃ. ৩০৬-৩০৭

৫৮। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫৫
৫৯। তদেব, পৃ. ১৭০
৬০। 'শ্রীরামচরিত মানস', 'অযোধ্যাকাণ্ড,' দোহা-৭৫, পৃ. ৩২০-৩২১
৬১। তদেব, 'উত্তরকাণ্ড', দোহা-৪২, চৌপাই-৩, পৃ. ২৭৮-২৭৯
৬২। 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২০৩